স্রোতের বিপরীতে : শিবনারায়ণ রায়

হাসান আজিজুল হক

চুরাশি সালের জানুয়ারিতে সল্ট লেকের বাসায় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তারপর কেটে গেছে আরও একটা যুগ। তখন তাঁর যে স্বাস্থ্য দেখেছিলাম — তেমন ভালো নয়, অ্যাজমার কষ্ট তাঁর বহুদিনের— শুনেছি এখন শরীরটা আরও ভেঙেছে, চেহারায় বয়েসের ছাপ পড়েছে, বলিরেখাগুলি কপালে কেটে বসে গেছে। দেখা হলে হয়তো দেখব ভগ্নস্বাস্থ্য এক জীর্ণ মানুষ। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ শিবনারায়ণ রায়কে আমি ভেবে উঠতে পারি না। তাঁর লেখা সবই প্রায় হাতে এসেছে, স্নেহবশে বা যে কারণেই হোক, তাঁর বেশির ভাগ নতুন লেখা তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেন। লেখাতে এখনও তাঁর তেমনিই ধার যা ছিল তাঁর তরুণ বয়সে। লেখার দীপ্তি তো বজায় আছেই, তাঁর এখনকার লেখা যেন আরও ঋদ্ধ প্রজ্ঞায়, চিন্তার দার্ঢ্যে; মনস্বিতায় তা যেন আরও উজ্জ্বল হয়েছে। এরকম যে মনে হয় তার কারণ সম্ভবত এই যে তাঁর চল্লিশের দশকের রচনা আমার মধ্যে যে তীব্র মতদ্বৈধ জাগিয়ে তোলে, বর্তমানের রচনাগুলিও প্রায় সেইভাবেই তাঁর মত ও পথের সঙ্গে ভিন্নতা প্রকাশে আমাকে আকুল করে। সত্যিই, শিবনারায়ণের রচনা আমাদের যেন বিতর্কপ্রবণ করে তোলে এ কালের গদ্য লেখকদের মধ্যে তেমন কমই দেখা যায়। ভালোভাবে নিলে বলা যায় যে তাঁর বেশির ভাগ রচনা উসকানিমূলক, প্রতিপক্ষকে সামনে রেখেই যেন সেগুলি রচিত হয়। আমার তো মনে হয় শিবনারায়ণ সবচেয়ে খুশি হন যখন কেউ তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। সর্বপ্রকারে শিবনারায়ণ রচনার যুক্তির অধীনস্থ হয়ে যাঁরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন, তাঁদের আনুগত্যে তিনি খুশি হন বলে মনে হয় না। সব লেখাতেই তিনি স্বাদহীন সচরাচর থেকে দূরে অবস্থান নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বিন্দু নির্মাণ করেন এবং ঐ ভিন্ন বিন্দু তৈরিতে তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ মেধা প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত প্রায় নিশ্ছিদ্র একটি যুক্তিবলয় আমাদের উপহার দেন। যে লেখা চিন্তা জাগায় না, পাঠকের নিজের মনের ভিতরে সন্তর্পণে গড়ে তোলা ভাবনা - দুর্গকে তছনছ করে দেয় না, যে লেখা প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে আমাদের ক্ষতবিক্ষত করে না, পাঠকের বিচলিত ও উত্তেজিত করতে পারে না, শিবনারায়ণ রায়ের কাছে সে লেখা তেমন কদর পাবে বলে মনে হয় না। নিজেও তেমন লেখা কমই লিখেছেন। বজ্রতুল্য যুক্তিবাণ নিক্ষেপের উপলক্ষ না থাকলে শিবনারায়ণ রায়ের রচনার দীপ্তি ঠিকমতো প্রকাশ পায় না। তিনি স্বীকার করবেন কি না জানি না, আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসনের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্লেটো এবং যাঁকে তিনি নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন, লেখক হিসেবে সেই প্লেটোর সঙ্গে শিবনারায়ণের যোগ আছে। প্লেটো তাঁর সুদূর পূর্বসূরী এই দিক থেকে যে দুজনেই বুদ্ধির সার্বভৌমত্ব মানেন। বাংলা উপন্যাস যে তাঁকে কিছুতেই খুশি করতে পারে না তার বহু কারণের মধ্যে প্রধান কারণ এই যে আমাদের কথাসাহিত্যে বুদ্ধি নয়, আবেগ ও ভাবপ্রবণতাই সবচেয়ে বড় অবলম্বন। বুঝতে অসুবিধে নেই যে শিবনারায়ণ রায় ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন।

এইবার শিবনারায়ণ রায় প্রসঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলি। তিয়াত্তর সালে একেবারে শেষে বা চুয়াত্তরের প্রথমে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্টিটিউট অফ বাংলা স্টাডিজ-এ বক্তৃতা দিতে আসেন। এর কয়েকদিন আগে উপাচার্য খান সারওয়ার মুরশিদ কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন আমাদের কয়েক জনের কাছে। শিবনারায়ণ রায়ের লেখা তখন সামান্যই পড়েছি, বরং কোনো পত্রিকায় তাঁর তীব্র সমালোচনাই আমার চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ভবনের তেতলায় মাঝারি আকারের হলঘর ঠাসা শ্রোতাদের কাছে শিবনারায়ণ রায়ের বক্তৃতা তখন অনেকটা এগিয়েছে, আমি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলাম। আমি রাজশাহীতে ছিলাম না। ওঁর বক্তৃতা ধরতে খুব তাড়াহুড়ো করে আমাকে ফিরতে হয়েছে। দেখলাম শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে শিবনারায়ণের বক্তৃতা শুনছেন। আমার দিকে অনেকেই চোখে বিরক্তি নিয়ে তাকালেন। তখন তিনি উনিশ শতকে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কেমন করে পালকিসুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে স্নান করিয়ে আনা হতো তার বর্ণনা দিচ্ছেন। শিবনারায়ণের বক্তৃতার বিষয় ছিলো— যেমন আন্দাজ করা যায় — উনিশ শতকে বাঙালি রেনেসাঁস। এ বিষয়ে তাঁর মূল বক্তব্য কি তা তিনি নানাভাবে জানিয়েছেন। সেই কথাটিই তিনি একের পর এক তীক্ষ্ণ যুক্তি দেখিয়ে নানা খুঁটিনাটি তথ্য উদ্ধার করে অকাট্যভাবে দাঁড় করাচ্ছিলেন। তাতে স্পষ্ট হচ্ছিল উনিশ শতকে জাগরণের চেয়ে কুসংস্কারের সুপ্তি আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে আমুণ্ড নিমজ্জিত থাকাটাই হয়তো বেশি সত্য ছিল। কেমন একটা রোষের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন। মনে পড়ে আমার মধ্যে কেবলই অস্বস্তি আর আপত্তির বিরূপতা দেখা দিচ্ছিল; অথচ কি করে তাঁর কথা খণ্ডন করা যাবে সে পথ আমি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একটা রাগ আর অসহায়ত্ব আমাকে ক্রমাগত খোঁচাচ্ছিল। উনিশ শতকের রেনেসাঁসের ব্যাপারে যাঁদের এক ধরনের ভাবালুতা রয়ে গেছে, তাঁর সমস্ত আক্রমণ যেন তাঁদের উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজের যুক্তির তূণ থেকে এক একটি চাঁচাছোলা শর নিয়ে তিনি নিক্ষেপ করছিলেন। তাঁর ঐ বক্তৃতার স্মৃতি আমার কাছে এখন আবছা হয়ে এসেছে, তবে সেই সময়ে বোধহয় এই কথাটা মনে হয়েছিল যে রেনেসাঁস ব্যাপারটাকে তিনি হ্যাঁ-না মেশানো জটিল একটা সমগ্র হিসেবে না দেখে অসম্ভব দক্ষতায় হ্যাঁ থেকে না- কে বিশ্লিষ্ট করে আলাদা সাজিয়ে রাখছিলেন এবং তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের সমস্ত জের যেন না-এর উপরেই পড়ছিল।

এদিকে ড. ডেভিড কফ তখন আইবিএস-এ ভিডিটিং প্রফেসর হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। তাঁর বেঙ্গল রেনেসাঁস অ্যান্ড ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম্ বইটি তখন বেরিয়ে গেছে। তাঁর মতে খালি পা থেকে জুতো পরা শুরু করাটাও আধুনিকতা তার রেনেসাঁসের লক্ষণ। এই মর্মে তিনি একটি পর একটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শিবনারায়ণ রায়ের বক্তৃতা

শোনার জন্য ডেভিড কাফ এক পাশে বসেছিলেন। শিবনারায়ণ যতক্ষণ বাংলায় বলেছিলেন ডেভিড প্রায় কিছুই বুঝছিলেন না। তিনি ইংরেজিতে বলতে শুরু করলে ডেভিড নড়ে চড়ে বসলেন। দেখতে দেখতে ডেভিডের ভ্রূ-তে একটার পর একটা গিঁট পড়তে শুরু করল। শিবনারায়ণ রায় — দীর্ঘ ছিপছিপে মানুষটি, মেধাপ্রয়োগে কোথায় যে তাঁর একটা শ্বাপদ-ক্ষিপ্রতা— অনর্গল কথা বলে চলেছেন। শুনতে শুনতে বিশালকার মার্কিন ভদ্রলোকটির মুখ লাল হয়ে উঠল। এই বক্তৃতায় শিবনারায়ণ ঘন্টাদুয়েক সময় নিয়েছিলেন। মনে পড়ে একবার ডানহাতের তর্জনী তুলে গৌরকিশোর ঘোষ প্রসঙ্গে বলেছিলেন কেমন করে তিনি নকশাল ছেলেদের ধমকে জুজু হয়ে যাওয়া বাসযাত্রীদের মধ্যে একা প্রতিবাদ করেছিলেন।

বক্তৃতার শেষে আমি দেখলাম শিবনারায়ণ রায় ডেভিড কাফের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। অস্ফুট দ্রুত কিছু বাক্যবিনিময় হলো দুজনের মধ্যে চকমকি পাথরে ইস্পাৎ ঠোকার মতো। ডেভিড কাপের কপালের একপাশ ভ্রূ-সমেক উপরে উঠে গেল — শিবনারায়ণ কোপানোর ভঙ্গিতে দুএকটি কথা বলে সটান ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি, সন্ধের দিকে আমাদের গেস্ট হাউসে গিয়ে খোঁজ - খবর করতেই শুনি শিবনারায়ণ রায়ের প্রবল জ্বর, জলবসন্ত ফুটে উঠেছে দেহে। দুপুরে যখন তিনি বক্তৃতা করছিলেন তখন তাঁর শরীর নিশ্চয়ই খুব খারাপ ছিল— কিন্তু তা একটুও বোঝা যায়নি। পরেও দেখেছি শিবনারায়ণ ব্যক্তিগত কথা বলতে একটুও পছন্দ করেন না। কঠিন যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থতার মধ্যেও দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যান।

যাই হোক, শিবনারয়ণ রায়ের সঙ্গে আমার দেখাই হলো না সেবার। কোনোমতে একটুখানি আলাপ হয়েছিল ওঁর স্ত্রী গীতা রায় আর কন্যা মৈত্রেয়ীর সঙ্গে। বোধহয় পরের দিনই আমাদের একজন সহকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাসে ওঁদের ঢাকায় পৌঁছে দিয়ে আসেন। যতদূর মনে পড়ে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তিনি ঢাকাতেই ছিলেন এবং বাংলাদেশের তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে কঠিন কথাও কিছু শুনিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অবস্থাটা তখন এমন যে তীব্র সমালোচনা করার বা না-করার সমান যুক্তিসম্মত কারণ অজস্র ছিল।

এর বেশ কিছুকাল পরে— তখন শিবনারায়ণ রায়ের সাহিত্যচিন্তা, কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা এবং কিছু ইংরেজি রচনা পড়তে পেরেছি— মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবিদ্যা বিভাগের গবেষণা কাজের জন্য আমাকে একটি বৃত্তি দেয়। আমার আবেদনের পক্ষে ডেভিড কফ সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু যা আমার প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না, শিবনারায়ণ রায় এই বৃত্তি পাবার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেন। শিবনারায়ণ রায় হলেন আমার কাজের তত্ত্বাবধায়ক।

যেদিন বন্ধু গোলাম মুশশিদের মেলবোর্নের বাসায় পৌঁছেছি, সেদিনই বিকেলে শিবনারায়ণ রায় টেলিফোন করে মুরশিদের কাছে জানতে চাইলেন আমি পৌঁছে গিয়েছি কিনা। এসেছি শুনে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। এমন সহৃদয় মোলায়েম একটি কণ্ঠ ভেসে এল টেলিফোনের তার বেয়ে যে আমি মুহূর্তের জন্য অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি জানি শিবনারায়ণ রায়কে অনেক দুর্মুখ কটুভাষী বলে জানেন, তবে আমি তাতে ঠিক একমত হতে পারি না। প্রয়োজনে তিনি তীব্রভাষী হয়ে উঠতে পারেন বটে, কিন্তু এমনিতে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায়, দৈনন্দিন সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি একেবারেই নির্লিপ্ত— এমন যে এ ধরনের কোনো প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা সমাজ ইতিহাস ভাবনায় এমন সম্পূর্ণ মগ্ন মানুষ আমি কমই দেখেছি। ইন্ডিয়ান স্টাডিজ বিভাগের নিজের ঘরে (তিনি বিভাগের লাইব্রেরি ঘরটাকেই নিজের ঘর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, সেই ঘরে ছাদ পর্যন্ত ঠাসা বই, বিদেশে কেন স্বদেশেও ভারতবিদ্যাবিষয়ক এমন সংগ্রহ দেখতে পাওয়া কঠিন।) একটি সাধারণ রিভলভিং চেয়ারে বসে পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকলেন সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। তিনি চা খেতে টি-রুমেও আসতেন না। বিভাগের সেক্রেটারি বেলা এগারোটর দিকে এক কাপ চা বা এক কাপ কফি দিয়ে আসতেন। এই সময়টায় তিনি কখনো লিখছেন, কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে গিয়ে খানিকটা সময় বইপত্র দেখে আসছেন বা দুই বগলে একরাশ বই নিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসছেন। কখনো কথা বলছেন তাঁর কোনো পিএইচ. ডি ছাত্রের সঙ্গে। যতদূর মনে পড়ে ম্যারিয়ান ম্যাডার্নের কাজ তখন শেষ হয়ে এসেছে, I have seen Bengali's Face এবং Bengali Poetry into English: An Impossible Dream দুই বই-ই বেরিয়ে গেছে। এলিজাবেথ বাককভস্কি তখন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ে তাঁর কাছে কাজ করছেন। গবেষণা বা পড়াশোনার কাজ নিয়ে তাঁর কাছে যাবার জন্য সময় অসময় কিছু ছিল না। ছাত্রদের কাজের ব্যাপারে তিনি ছিলেন কড়া মাস্টারমশাই। ওখানকার ছাত্রছাত্রীদের কর্মঠ বা উদ্যোগী বলা কঠিন— মহাসুখের দেশ অস্ট্রেলিয়া— কেমন আয়েশি চালচলন ছাত্রছাত্রীদের, একটা ডিক্রি করতে পাঁচ বছর সাত বছর লাগাতে এরা পিছপাও নয়। ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত থাকত ওরা শিবনারায়ণের কাছে ভিড়তে। কিন্তু ওদের তিনি ছাড়তেন না। সপ্তাহে দুদিন বিভাগে সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিন বিভাগের জন্য, অন্যদিন জড়ো করতেন অন্যান্য বিভাগের আগ্রহী পণ্ডিত ও ছাত্রছাত্রীদের। টেবিলে শস্তা লাল ওয়াইন হাতে হাতে ঘুরতো। বিকেল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলত সেমিনার। কথা বেশির ভাগ সময় শিবনারায়ণই বলতেন। মানববিদ্যার সমস্ত শাখায় কথা বলার অধিকারী তিনি। কেবলই তর্ক জাগিয়ে দিতেন, তাঁর ভাষায় কাইট ফ্লাইং করে। অল্পবুদ্ধি অস্ট্রেলিয়া যুবক-যুবতী ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে পাশের চেয়ারে ঠ্যাং তুলে দিয়ে যা করত তাকে তর্ক বলা যায় না, বলা যায় হুজ্জুতি। এই হুজ্জুতি করতে করতে সন্ধে গড়িয়ে যেত, যানবাহনের সংখ্যা কমে আসত রাস্তায়। কোনো কোনো দিন আমি আর গোলম মুরশিদ ঝোড়ো হাওয়ায় কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বাসের অপেক্ষায়

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রায় জমে যেতাম, আর বলতে কি সপ্তাহের দু-দুটি দিনে এই লম্বা সেমিনারকে অভিসম্পাত করতাম। আমার পাশে বসে যে অস্ট্রেলীয় নির্বোধ চেহারার মেয়েটি অনবরত সিগারেট টানত আর ঘাঁউ ঘাঁউ করে কাশত সে একদিন আমাকে তার স্বপ্নের কথা জানায়। সে-স্বপ্ন এই : শিবনারায়ণ রায়ের সেমিনারে আর তাকে আসতে হবে না। সে ট্যাক্সি চালাবে। ঘোড়ার ডিমের পড়াশোনা আর তার ভালো লাগে না, ভালো লাগে না শিবনারায়ণের পেপার তৈরি করা নিয়ে এরকম অসন্তুষ্ট তাড়না। আমি সামান্য সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করি, চালায় তোমাদের দেশের মেয়েরা ট্যাক্সি? নিরাপত্তার একটা ব্যাপার আছে না? হুশ হুশ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সেই মেয়ে আমাকে জানায়, একটা বড় ছুরি কিনে কোমরে লুকিয়ে রাখবে— কি করে চালাতে হয় ছুরি তা সে শিখতে শুরু করেছে।

শিবনারায়ণ রায়ের এই সেমিনারগুলির কথা আমার খুব মনে পড়ে আজও। থাকতাম আমার পরম বন্ধু গোলাম মুরশিদের বাসায় তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে কাজকর্ম তখনও ঠিক শুরু করতে পারিনি, শিবনারায়ণ রায় আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেসা করতেন, কাজ আরম্ভ করতে পেরেছি কিনা, দরকারি বইপত্র পাচ্ছি কিনা। বলতেন কোনো বইয়ের প্রয়োজন পড়লে আমি যেন জানাই।

একটা দেশ ঠিকমতো চললে মানুষ নিশ্চিন্তমনে নিজের ঠিক কাজটি বেছে নিয়ে তাতে মনোযোগ দিতে পারে। এটা অস্ট্রেলিয়ায় খুব সম্ভব ছিল। সেমিনারে বসে যাঁরা কথা বলতেন, তাঁরা তাঁদের কল্পনা ও চিন্তার সম্ভবপর সব পথ-বেপথ গলিঘুঁজি সকলের সামনে নিঃসংকোচে তুলে ধরতেন। শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায় 'কাইট ফ্লাইং' অবাধে চলত। কখনো ভাবতাম, কথা, কথা, কথায় এত ফেনা! কিন্তু একথাও ঠিক, এই সেমিনারগুলিতে মনের সবগুলি দরজা-জানলা খুলে যেত, তীব্র উষ্ণ আলোয় মনের ভেজা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার জায়গাগুলো নিজের কাছে দৃশ্যমান হয়ে উঠত। এই সেমিনারেই অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে অম্লান দত্ত কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একটি অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান।

সপ্তাহান্তিক ছুটিতে কখনো কখনো গোলাম মুরশিদের বাসায় আসতেন শিবনারায়ণ। সঙ্গে আসতেন গীতা বৌদি। ছেলেমেয়েরা কখনো নয়। গীতা বৌদি না আসতে পারলে শিবনারায়ণ রায় আসতে পারতেন না, কারণ তিনি কখনো গাড়ি চালাতেন না, চালাতেন গীতা বৌদি। এইখানে এক অন্যরকম শিবনারায়ণ— আমি একটু অবাকই হতাম। মুরশিদের ছেলেমেয়ে অমি অন্তুর সঙ্গে তিনি শিশুর মতোই খেলায় মেতে উঠতেন। অন্তু ছিল খুব দুরন্ত, তাকে সামলানো কঠিন, ভাঙাচোরায়, জিনিসপত্র তছনছ করতে খুব পোক্ত। শিবনারায়ণ তার সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতেন, মজার মজার গল্প শোনাতেন তাকে। বাড়ির কাছে মেরি বায়ারনং নদীর সুবজ ঘাসমোড়া পাড়ে বার্চ গাছের নিচে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের দুপুরটা গড়িয়ে বিকেলে পড়ত। শিবনারায়ণ আমাদের কথা মন দিয়ে শুনতেন, তাঁর কথার জোর প্রতিবাদ করলেও অধৈর্য হতেন না। আলোচনার সময় দেখতাম অত্যন্ত সাধারণ তথ্য থেকেও খুব নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারতেন তিনি। একমত হতে না পারলে স্বীকার করতে হতো যে তিনি অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পান এবং যা দেখতে পান তা ঠিক সাধারণের চোখে পড়ে না।

অ্যাজমার শ্বাসকষ্ট তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। কিন্তু অত কষ্টের মধ্যেও সিগারেট খাওয়ার বিরতি ছিলো না। একটা শেষ হলেই আর একটা ধরাতেন। এর মধ্যে একদিন বিভাগে গিয়ে শোনা গেল 'মি: রে' আসেননি। তিনি খুবই অসুস্থ। বিভাগের সেক্রেটারি রাশিয়ান মেয়েটি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কারণ মি: রে বিভাগে আসবেন না এটা অসম্ভব ঘটনা। নিশ্চয়ই মারাত্মক কিছু ঘটেছে। এইসব কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এমন সময় সেক্রেটারি মেয়েটি 'মি: রে!' বলে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। চেয়ে দেখি শিবনারায়ণ রায় বই ভরতি বিরাট হাতব্যাগটা টানতে টানতে ঘরে ঢুকছেন। মুখের উপর তীব্র যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে, কিন্তু সেটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিনি স্বাভাবিক গলায় আমাদের কুশল সম্বোধন করলেন। শোনা গেল আর্থরাইটিসের আকস্মিক আক্রমণে তাঁর ডান কাঁধ আর ডান হাত প্রায় অবশ হয়ে গেছে।

মেলবোর্নে আমি টিকলাম না। উনআশির নভেম্বরে আমি ফিরে আসি। সেই সময়েই আমাদের তিনি জানিয়েছিলেন, চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কলকাতা চলে আসবেন আর সবটা সময় দেবেন পড়াশোনা, লেখালেখি, মানবেন্দ্র রচনাবলী আর একটা মননশীল পত্রিকার সম্পাদনার কাজে। অক্ষরে অক্ষরে তাই করেছেন তিনি গত প্রায় দুই দশক ধরে। বোধহয় আশিতেই ফিরে এলেন, বার করলেন জিজ্ঞাসা পত্রিকা যেমন তিনি বলেছিলেন। জিজ্ঞাসা পত্রিকার কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে এই পত্রিকার একটি সংখ্যাও বাদ পড়েনি। মানবেন্দ্র রচনাবলীর চারটি ভল্যুম বেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অকল্পনীয় পাণ্ডিত্য, সুতীক্ষ্ণ মেধা আর কঠোর পরিশ্রমের যে পরিচয় তিনি রেখেছেন মানবেন্দ্রনাথের বিপুল পরিমাণ রচনা সম্পাদনার কাজে তার তুলনা মেলা কঠিন। আমার নিজের ধারণা শিবনারায়ণ রায় ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা হতো অসম্ভব এবং এই কাজটিই হবে তাঁর জীবনের সেরা কাজ। কার পক্ষে এই কাজ করা অসম্ভব বলছি এইজন্য যে শিবনারায়ণ নিজে স্বীকার করেছেন, এ কালের চিন্তকদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন। এই আকর্ষণ তিনি বোধ করেছেন শুধু তাঁর রচনার প্রতিই নয়, মানুষ মানবেন্দ্রনাথও তাঁর অনুরাগ আদায় করেছেন প্রবলভাবে। মনে হয় দুজনের চিন্তা গভীর সাযুজ্য, দুজনের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, সভ্যতার ইতিহাসকে রেখার দৃষ্টিকোণ, মানবজাতির শিল্প-সংস্কৃতির বিপুল ভাণ্ডারকে বিচার ও বিশ্লেষণের মৌলিক মানদণ্ডগুলি খুব কাছাকাছি ছিল। মানবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় শিবনারায়ণ ছিলেন তরুণ যুবক— দু হাত দিয়ে পৃথিবীকে মন্থন করে নেবার এটাই সময়। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি

সমাজ যা কিছু মানুষের জন্য অব্যবহিত বাস্তব সেসব সম্পর্কে মূল অবস্থানগুলি এই বয়সে বাকি জীবনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। শিবনারায়ণ চল্লিশের দশকে, তাঁর তরুণ বয়সে, জীবন সম্পর্কে, মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মূল প্রত্যয়গুলিকে ছাঁচ পেয়ে যান এরকম চিরকালের জন্য এবং তাঁর মানস গঠনপ্রক্রিয়ায় মানবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর দর্শন নিশ্চয়ই একটা ইতিবাচক ভূমিকা রেখে থাকবে। এই কথাটিকে তিনি নিজেও স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেননি।

শিবনারায়ণ নিজেকে বলেছেন মানবতন্ত্রী। এক জায়গায় তিনি এই রকম লেখেন : বিশ্ব আমার স্বদেশ, মানুষ আমার স্বজন। ইহজগৎ আর মানুষ ছাড়া আর কোনো বাস্তব নেই শিবনারায়ণের জন্য। মানবজগৎ আর মানবীয়তার বাইরে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। সহজ কারণেই নিজেকে তিনি নাস্তিক বলেছেন। একটুখানি ছাড় দিয়ে নিজেকে তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী বলতেও রাজি হননি। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস নেই, নাকি তাঁর ইহজাগতিক বাস্তবের ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই এটাই তিনি বলতে চান, জানি না। দুটোর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে কিংবা হতে পারে কোনো পার্থক্য নেই তার কাছে। তাঁর চেতনায় ধরা আছে যে ঈশ্বরহীন ইহজাতিক মানববাস্তবতার বাইরে একটা পা-ও ফেলতে তিনি ইচ্ছুক নন। মনে রাখা দরকার ঈশ্বরের অস্তিত্বের দায়ভার না নিয়ে শুধু মানুষের দায়িত্ব নেওয়া ঢের বেশি কঠিন। বিশেষ করে যদি এই অবস্থা থেকে যে 'বহুদূর যেতে পারে মানবসমাজ'। ঈশ্বরের ঝামেলা চুকিয়ে ফেলেছেন বলে শিবনারায়নের মানুষের প্রতি দায় অনেক বেড়েছে। প্রতিনিয়ত তিনি মানবসমাজের ব্যাধিগুলির সন্ধান করেন আর তাদের থেকে নিরাময়ের কথা ভাবেন। একটা কথা এখানে বলা আমি খুব দরকার বলে মনে করি। অনেককে বলতে শুনেছি শিবনারায়ণ রায়কে যে দাম্ভিক বলে মনে হয় তার আসল কারণ হচ্ছে তিনি আগাগোড়া সিনিক। শিবনারায়ণ রায় সম্বন্ধে এই কথাটি পুরোপুরি মিথ্যা। উলটে বরং এটাই বলা যায় যে মানুষের উপর সীমাহীন আস্থার কারণেই তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন এবং গভীর ও বাস্তব আশাবাদ। মানুষের অসীম সামর্থেও তাঁর আছে দৃঢ় বিশ্বাস। বার বার তিনি বলেন, পারস্পরিক সহযোগের ভিত্তিতে মানুষই গড়ে তুলতে পারে কল্যাণময় সমাজ। পারে তার নিজের হাতে-গড়া শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি, তার সভ্যতার বিরাট ইমারত— আবার সেই ধ্বংসস্তূপের উপরে মানুষই গড়ে তুলতে পারে নতুন সুস্থ সমাজ। এই মৌলিক প্রত্যয় থেকে শিবনারায়ণ সারাজীবন একটু নড়েননি। মানুষ যা করে বা করতে পারে তাই তার পরিচয়—ধর্ম, ঈশ্বর, পরলোক, স্বর্গ নরক এইসব বিচিত্র প্রহেলিকা কেবলই ধাক্কা দিয়ে মানুষকে তার স্বধর্ম থেকে চ্যুত করে।

শিবনারায়ণ একেই মানবতন্ত্র বলেছেন এবং উদার মানবতাবাদ থেকে একে সযত্নে পৃথক করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি রূঢ়ভাবে মানুষের আদর্শিক ধারণাকে নাকচ করেছেন। সেইজন্য শিবনারায়ণের লেখায় বারে বারে মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, তাগা-তাবিজ, ভক্তিমার্গ, গুরুবাদ, পরলোক ইত্যাদি নিয়ে তীব্র মন্তব্য দেখা যায়— এই কারণেই তিনি ঘুরেফিরে যুক্তি বুদ্ধি বিজ্ঞান বিশ্লেষণের কথা বলেন। মানুষের বাস্তব থেকে সরের মতো ছেঁকে-তোলা তথাকথিত দয়া মায়া দেবত্ব সাত্ত্বিকতা এইসব ফাঁকা বুলিকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষকে তার যথার্থ প্রকৃতির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন তিনি। মানুষের একটা সংজ্ঞা ঠিক করার চেয়ে তাকে প্রকৃতি -নির্দিষ্ট একটা মূর্তি হিসেবেই দেখা প্রয়োজন।

খুব সঙ্গত কারণেই শিবনারায়ণের ঝোঁকটা গিয়ে পড়ে ব্যক্তির উপরে। সহযোগের কথা তিনি বলেন। সেটা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই আছে, নাকি নিজের প্রয়োজন ও স্বার্থ থেকেই জন্ম নেয় এই সহযোগ সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়। —তবে এই সহযোগের কারণেই দেখা দেয় সমাজ, যৌথজীবন, সমষ্টির পরস্পর-সংবদ্ধ বিশাল মানব কর্মশালা। শিবনারায়ণ জানিয়েছেন তাঁর চিন্তাধারায় তিনজন মনীষীর প্রভাব কাজ করেছে। যদি সঠিকভাবে মনে করতে পারি তাহলে সেই তিন জন হলেন কার্ল মার্ক্স, ফ্রয়েড এবং বার্ট্রান্ড রাসেল। আমার নিজের ধারণা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনায় তিনি মার্ক্সীয় পদ্ধতি অনেকটাই অনুসরণ করে থাকেন বটে, বাস্তব তথ্যগুলিকে ঘননিবদ্ধ করে সাজান, ফাঁকা অনুমান প্রত্যাখ্যান করেন, আরোহ অবরোহ দুটি পন্থাই ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্তত মার্ক্স -এর শ্রেণীতত্ত্ব এবং দ্বান্দ্বিক বাস্তববাদের মত মানেন না। শুরু থেকে শেষ অব্দি তাঁর সমস্ত লেখা খুঁটিয়ে পড়লে হয়তো বোঝা যাবে আলোচনার পদ্ধতি কখন কিভাবে তিনি বদলেছেন অর্থাৎ কি ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। আমি স্বীকার করি সেভাবে তাঁকে অধ্যয়ন আমি করতে পারিনি, তবে ফ্রয়েড থেকে যে তিনি মানুষের মনের গঠনটা বোঝার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষের মনের অতলে ডুব দিয়ে তার সামাজিক অসামাজিক কর্মপ্রবণতার কেন্দ্রগুলির অনুসন্ধান করার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছেন, সেটা বোধহয় বলা চলে এবং ফ্রয়েড ও রাষ্ট্রভাবনায় যে কোনো ধরনের সমূহবাদ, সমষ্টিবাদের প্রতি তাঁর একটা অসহিষ্ণু বিরূপতা লক্ষ করা যায়, সেটা বাস্তবত একদিক থেকে মার্ক্সকে প্রত্যাখ্যান করারই সামিল। প্লেটো এবং হেগেল যে তাঁর পছন্দের দার্শনিক হতে পারেন না, তার কারণ এঁদের দুজনেরই রাষ্ট্রভাবনায় মুখচোখহীন একটা লেপামোছা সমূহবাদ আছে। কিন্তু এই মতের দায়টা তিনি সরাসরি মার্ক্সের উপর চাপিয়ে দেন না, কারণ মার্ক্সের চিন্তায় ব্যতিকে দেখতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তিকে লেনিনসৃষ্ট বাস্তব রাষ্ট্রে দেখা যায় বলে তিনি কখনোই স্বীকার করবেন না। এই কারণেই লেনিনের প্রতি শিবনারায়ণের বিরূপতা অনেক বেশি স্পষ্ট। লেনিনকে তিনি মার্ক্সবাদী মনে করেন না বলেই জানি।

ব্যক্তিবাদের পথ ধরেই শিবনারায়ণ রায় শুধু রাসেল নয়, হিউম, মিল, বেন্থাম প্রমুখ উপযোগবাদী দার্শনিকদের খুব কাছাকাছি চলে আছেন। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ যে রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য সবচেয়ে বেশি সম্ভব, শিবনারায়ণ সেই ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলেন এবং এই গণতন্ত্রের জন্য তিনি তাঁর সর্বশেষ যুক্তিটিও প্রয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন। চেনের ছাত্র আন্দোলন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইয়োরোপের গণতন্ত্র-কামনা একদিকে তাঁকে উদ্বিগ্ন করলেও উৎসাহিত

করেছে অনেক বেশি। উদ্বেগের কারণও আবার গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের জন্য এই যে প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা গণতন্ত্রের বদলে নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যায়।

শিবনারায়ণের চিন্তার কেন্দ্রে দুটি বিষয়: ব্যক্তি আর গণতন্ত্র। আমার মনে হয় এই দুটি ধারণা থেকে এগোলে শিবনারয়ণকে বোঝা সহজ হয়ে যেতে পারে। গণতন্ত্রের ধারণায় তিনি সহজেই মিল-কে মনে করিয়ে দেন— ব্যক্তির জন্য অপ্রতিহত গণতন্ত্র। রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হচ্ছে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতায় কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেটা দেখা। রাষ্ট্রের নিজের হস্তক্ষেপের প্রশ্নই ওঠে না। যাই হোক, এই পুরো বিষয়টা নিয়ে আমার নিজের অনেক কথা বলার থাকলেও সে-সব কথা এখানে তোলা অবকাশ নেই। তার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রয়োজন।

রাষ্ট্র ও সমাজভাবনায় শিবনারায়ণের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এবং সে-সব বক্তব্য নিয়ে আমাদের কিছু বলার থাকলেও , প্রধানত শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির বিশ্লেষক হিসেবেই তিনি আমাদের কালের একজন প্রধান শিল্প-সাহিত্য সমালোচক। শিবনারায়ণের কোনো একটি লেখা যিনি পড়েছেন তিনিই স্বীকার করবেন যে, বহুগ্রাহী বলতে যা বোধায় তিনি তাই। তিনি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেন শিল্প-সাহিত্যের যে কোনো শাখায়। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, কবিতা, কথাসাহিত্য, মহাকাব্য, নাটক— সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিটি শাখায় তিনি অভিজ্ঞ রসজ্ঞানী— শিল্পের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের চাবিকাঠি তুলে দিতে পারেন পাঠকের হাতে। শিবনারায়ণের সমালোচনার তিনটি দিক পাঠক একটু লক্ষ করলেই ধরতে পারবেন। এক: আলোচ্য শিল্পশাখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য যা প্রধানত তাঁর পড়াশোনা থেকে এসেছে; দুই : তিনি শুকনো বইয়ের সমালোচক নন, তাঁর নিজের শিল্প-উপভোগেরই নিপুণ বিশ্লেষক; এমন লেখা সহজেই ব্যক্তিগত হয়ে যেতে পারত, তা হয় না তাঁর এক ধরনের ক্লাসিক রুচির কারণে এবং প্রভূত অধ্যয়নের ফলে। তাঁর লেখায় নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ত একটা ভঙ্গি সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়। তিন : তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে কোনো না কোনো একটা মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন।

তবে শিল্পসমালেসাচনাতেও তাঁর জন্য দুটি ধ্রুব বিন্দু থাকে : গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি। এই দুটি মূল বিন্দুর কারণে শিবনারায়ণকে যেমন সহজে চিনতে পারা যায়— তেমনি এই বিন্দু দুটি তাঁর আলোচনাকেও কোনো না কোনোভাবে শাসন করে। আমরা দেখতে পাই শিবনারায়ণের রুচির ও পছন্দের সীমানা। হয়তো পশ্চিমের সাহিত্য শিল্পে একান্ত মগ্নতা শিবনারায়ণের হাতে দেশকাল নিরপেক্ষ কিছু মানদণ্ড তুলে দিয়েছেন যে-জন্য স্থানকাল-নির্দিষ্ট বাস্তবতার বিশেষ চেহারা তিনি উপেক্ষা করতে পারেন বা টপকে যেতে পারেন। ব্যক্তিমুখ্যতাই তাঁর কাছে চরম একটা মাপকাঠি হবার ফলে তিনি সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করতে চান বিশেষ কতকগুলি কষ্টিপাথরে। তাঁর সমালোচনার প্রধান কষ্টিপাথর হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা এবং শূন্যতা। যে-সাহিত্যে ব্যক্তিকে তিনি alienated দেখতে পান, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা এবং অবলম্বনহীন শূন্যতার মধ্যে ব্যক্তির নিজের সম্মুখীন হবার যন্ত্রণাদায়ক বাধ্যতা তিনি লক্ষ করেন, তাঁর নিরিখে সে সব সাহিত্য অনেক বেশি গ্রহনীয় হয়ে ওঠে। প্রলাপী মাংসের কলরোলে যে ব্যক্তি ডুবছে ভাসছে, রিরংসায় বাসনায় যে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, নিজের লড়ায়ের ক্লান্ত অবসন্ন যে-মানুষটির জন্য বাঁধাধরা কোনো নৈতিক আদেশাবলি নেই— সাহিত্যে সেই ব্যক্তিকে দেখতে পেলে শিবনারায়ণ খুশি হন বেশি। এই দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রতি তাঁর এমন আকর্ষণ। জীবনের ছুটন্ত কৃষ্ণ কলার প্রবাহ না দেখতে পেলে যে-সাহিত্য তাঁর কাছে ফ্যাকাশে নীরক্ত বলে মনে হয়। শিবনারায়ণের মানদণ্ডে আমি এমনিতে কোনো আপত্তি দেখতে পাই না, কিন্তু এটাই একমাত্র মানদণ্ড এরকম একটা জবরদস্তির সুর তাঁর লেখায় যেন শুনতে পাওয়া যায়।

সবশেষে বলতে চাই, আমাদের সাহিত্যে শিবনারায়ণ রায় একজন অসাধারণ গদ্যশিল্পী। স্বচ্ছ, নির্ভার, ঋজু, নিশিত এই গদ্য চলন, ক্লাসিকধর্মী, ধীর; বাক্যগঠন প্রথাসিদ্ধ— কিন্তু প্রতিটি শব্দ ওজন করা—সাজানো ইটের গাঁথুনির মতো, একটি নৈয়ায়িক পরম্পরায় দৃঢ়সংবদ্ধ। শিবনারায়ণ রায় বাংলা গদ্যের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি লেখায় অন্তত দু-তিনটি নতুন শব্দ উপহার দেন তিনি যাদের অভিধানে পাওয়া যায় না, সিদ্ধ হয় কি না তা বলাও কঠিন কিন্তু লক্ষ্যভেদে সুনিশ্চিত। সমাজবিশেষে প্রচলিত আরবি ফরাসি কিছু মুখের বুলিও তিনি তাঁর গুরুতর প্রবন্ধে ব্যবহার করেন।

আমি এখন খুব আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করি যে বয়সের ভার তাঁর রচনাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি। তাঁর কলম ও মস্তিষ্ক এখনও আরও সচল হয়েছে। উৎকর্ষ, পরিমাণ, পরিণতি যে দিক থেকেই দেখি না কেন তাঁর সম্পর্কে এই কথা সত্য। আমাদের জন্য তা সৌভাগ্য বটে!